ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 17-23
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.174

সাধারণ জীবন থেকে সাহিত্য-সৃজন: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিত

সরলা মাণ্ডি, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 16.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nabaneeta Dev Sen was one of the foremost creators in Bengali short fiction who gave artistic expression to the varied experiences of ordinary people. In her selected short stories, the everyday joys and sorrows, struggles, laughter, happiness, and pain common lives find vivid portrayal. She sought to capture these aspects with a subtle and sensitive perspective eye. Her distinctive feature is presenting ordinary life in a simple manner without exaggeration. In her short stories, relationship between men and women, social realities, education, politics and even psychological conflicts in the diverse contexts of both urban and rural life are vividly portrayed. Through a blend of satire, wit and a human perspective, she has beautifully transformed the ordinary events of everyday life into art. The readers of her short stories do not merely enjoy the narratives; rather they perceive the hidden truths and deeper significance of ordinary life. Nabaneeta Dev Sen has demonstrated that ordinary life is the primary source of literature, and that a writer's sensitive vision can transform that life into art. A distinct dimension of women's experiences finds unique expression in her stories. She portrays women's struggles, social constraints, and their yearning for freedom in a very natural way. As a result, a feminist perspective is also reflected in her narratives.

Keywords: Ordinary life, Everyday Reality, Urban and Rural life, Women's Freedom, Women's Experiences, Contemporary Social Picture, Politics and Education, Family and Relationship, Satire and Humor

নবনীতা দেবসেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিথযশা সাহিত্যিক। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপনাস্যিক ও ছোটগল্পকার, কিন্তু কবিতার হাত ধরেই তাঁর সাহিত্য জীবনের পথচলা শুরু। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' (১৯৫৯) । এই কাব্যগ্রন্থ দিয়েই তাঁর শিল্পীজীবন সাধনার জয়যাত্রা শুরু। তিনি মূলত কবি হলেও গল্পকার হিসেবে তিনি এক স্বতন্ত্র ধারায় বিরাজমান, তাঁর গল্পের বিষবস্তুর বৈচিত্র ও গাম্ভীর্য তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পচর্চা নিয়ে তিনি বলেছেন-

> "প্রথমে আমি শুধু কবিতাই লিখতুম, আর যাঁরা অনায়াসে গল্পলেখেন, অবাক বিস্ময়ে ভাবতুম তাঁরা নিশ্চয় ম্যাজিক জানেন। কেমন করে সাজিয়ে তোলেন গল্পের পরম্পরা? একসময় টের পেলাম গল্প নিজেই নিজেকে তৈরী করে, আমার কাজ কেবল থেমে যাওয়া।"[১]

শিল্পী বা সাহিত্যিক মাত্রই তাঁর লেখনীর মধ্যে উঠে আসে সমকালীন সময়, সমাজ ও ব্যক্তিসত্তা। এর থেকে নবনীতা দেবসেনের গল্পগুলি ব্যতিক্রম নয়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির বেশিরভাগই সমাজ দ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। প্রথম গল্প যখন লিখতে শুরু করেন তখন তিনি ছাত্রী ছিলেন। তিনি বলেছেন-

> "যদিও আমার প্রথম গল্প বেরিয়েছিল ১৯৫৬ বা ৫৭ - তে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায়। আমি তখন ছাত্রী। সে গল্প হারিয়ে গেছে, এবং পরবর্তী গল্পগুলিও।"[২]

সমাজের নানান অসঙ্গতিকে তিনি কৌতুকের সঙ্গে গল্পে পরিবেশন করেছেন। তিনি গল্পগুলিতে বাস্তব জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি, প্রাঞ্জল দৃষ্টি গুনসম্পন্ন পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পের আঙ্গিকে ও ভাষার মধ্যে রয়েছে সহজ সরল ও পরিচ্ছন্নতা, কোথাও কোন জটিলতা নেই। নবনীতা দেবসেন লড়াই করে গেছেন সারাজীবন, তিনি যেমন একদিকে ছিলেন লেখক তেমনেই অন্যদিকে তিনি ছিলেন সাংসারিক এবং তার সাথে বাইরের নানান কাজ তিনি একসঙ্গে সামলে নিতেন। তাঁর জীবনের যে লড়াই কখনো নিজের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙ্গে, কখনো বা জীবনের সঙ্গে অবিরাম ঘটে থাকত। তিনি সমাজের নানা অচলয়াতনিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রে স্বাধিকারের, আত্মবোধের পরিপূর্ণ মানবিকতার প্রশ্ন খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন সাহিত্যের মধ্যে।

নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যচর্চার বৃহত্তর অংশে ফুটে উঠেছে নারী জীবনের কথা। তিনি তুলনামূলক বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন বলে দেশ বিদেশের নানান বিষয় তাঁর আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে মিথ ও পুরাণকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন। নারীর চার দেওয়ালের মণিকোঠার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে আজ তারা অসীমের পথে পা বাড়িয়েছে। তাদের এই স্বাধীনতা অর্জন অনেক প্রতীক্ষার কষ্টের ফল এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের আত্মত্যাগের কথাও বর্ণনা করেছেন। মানবজীবনের নানান দিক আলোচিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে। তিনি পদ্মশ্রী (২০০০), সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার (১৯৯৯), কমলকুমার জাতীয় পুরস্কার (২০০৪) প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ছোটগল্প তার এক অমর সৃষ্টি। প্রসঙ্গত আমরা নবনীতা দেবসেনের ছোটগল্পের মধ্যে খুঁজে পায় সাধারণ মানুষের জীবনের নানান অভিজ্ঞতাকে। এখানে আমি আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে বেশকয়েকটি ছোটগল্প নির্বাচন করেছি, যেমন- 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ', 'খেসারৎ', 'পরীক্ষা', 'জীবে দয়া', 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন', 'চোর-ধরা', 'সেদিন দুজনে'।

নবনীতা দেবসেনের এক অন্যতম ছোটগল্প হল 'গদাধর উইমেন্স কলেজ'। এই গল্পে তিনি এক বাস্তব সময়ের পরিপ্রেক্ষিতকে ও মনুষ্য সমাজের জটিলতাকে তিনি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পটি 'গল্পগুজব' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গল্পের কথিকা শ্রীমতী ও গীতু। গল্পের কথিকা তার দীর্ঘ দশ বছরের বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমি জীবনযাপন করে কলেজ জীবনের পুরনো বন্ধু গীতুকে বলছে। তারা একসময় কলেজে একসঙ্গে পড়ত। গীতু এখন গদাধরপুর উইমেন্স কলেজের শিক্ষিকা। তারা দীর্ঘ দশ বছরের পর কলেজ জীবনের পূর্ব ঘটনাকে স্মৃতিচারণ করছে। তখন গল্পের কথিকা বলছে-

> "আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: 'ও আমার গোলাপবালা'।"[৩]

গদাধরপুর একটি ছোট গ্রাম, শহর বললেও অনেকটাই বলা হবে। এই গদাধরপুরেই তার বান্ধবী গীতু থাকে। গদাধরপুর একটি গ্রাম্য পরিবেশর জায়গা। গল্পের কথিকার এই গদাধরপুর অপছন্দের। তাই সে গীতুকে বলছে-

> "সত্যি গীতু, তোরা যে কী করে থাকিস গদাধরপুরে! ওখানে তো আর পাঠচক্র-টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথা, গাইয়েই বা কই? সভ্য সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কী করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলে তো কিছুই নেই।"[৪]

গদাধরপুর সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত বলে মনে করেন গল্পের কথিকা। তাই গল্প কথিকা গীতুকে বারবার বলেছে এই রকম অনাড়ম্বরপূর্ণ অজপাড়াগাঁতে তার কোনমতেই থাকা সম্ভব নয়। তাই সে গীতুকে অনেকটা ব্যাঙ্গের সঙ্গে বলেছে-

> "যেমন জায়গা তেমনি কলেজ! কী করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়। কী করেই বা আছিস ওই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? বোরিং লাগে না? বিয়েটিয়ের নাম

তো করিস না। লাগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাশুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, একটু বয়স্থা এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হলো, এরপর আর কবে বিয়েটা করবি শুনি? চিরকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গোরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি একটা লাইফ হলো গীতু?"[৫]

এরপর দেখা যায় গল্প কথিকাকে তাঁর নিজের জীবন সত্তার দিকে ফিরে আসতে দেখা যায়। গল্প কথিকা আক্ষেপ করে বলে যে তার কত স্বপ্ন ছিল, কত প্ল্যান করে রেখেছিল, তারপর তার বিয়ে হয়ে যায় বড়লোকের বাড়িতে। গল্প কথিকার স্বামী অনেক বড় অফিসে চাকরি করে, সারাক্ষণ ধরে কাজ করে করে যন্ত্রবৎ মানুষে পরিণত হয়েছে। তার স্ত্রীর প্রতি সময় দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। তার স্বামী বলে-

"বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না বুঝলে।"[৬]

তারপর গল্প কথিকা হতাশ করে বলেছেন-

"আমার জন্য তো আয়া আছে ড্রাইভার আছে খানসামা আছে - মালী বাবুর্চি ঠাকুরচাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে! আবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?"[৭]

জীবনের কাছে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জীবনের সবকিছুর গুরুত্ব আলাদা আলাদা ভাবে মানব জীবনে ধরা দেয়। গল্প কথিকার গাড়ি, বাড়ি, টাকা, পয়সা সবকিছু থেকেও সে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। তার স্বামী সন্তান সংসার নিয়ে সে যেন নিজের সত্তার অস্তিত্বটাই আর খুঁজে পায় না। তাই সে আক্ষেপের সুরে বলে-

"ঘর সংসার ছেলেপুলে নিয়ে ন্যাতা জোবড়া।"[৮]

এরপর গল্প কথিকাকে রেওয়াজ করতে দেখা যায়, এমনকি একটা স্পেশাল ক্লাসে যোগদান করতেও। গল্পের শেষে দেখা যায় গল্প কথিকা গীতুকে বলছে-

"ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে?"[৯]

এর থেকে বোঝা যায় যে কলেজের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা বা ক্ষমতায়ন আসলে কতটা সম্ভব হয়েছে? সেটা লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুধু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নয় নারীর প্রকৃত অধিকার, আত্মসম্মান ও সুযোগের প্রয়োজন।

'খেসারৎ' নবনীতা দেবসেনের আর এক অন্যতম গল্প। এটিও 'গল্পগুজব' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল সুফল মাঝি। গল্পটি শুরু হয়েছে- "হাই! মা! মা রে! মা গ!"[১০] এক শোকসন্তপ্ত কথার মধ্য দিয়ে। সুফল মাঝি তার পরিবারের সবাইকে একসাথে হারিয়েছে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গল্পটিতে লেখিকা মূলত অসমবয়সী সম্পর্কের এক বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে একজন কমবয়সী মেয়েকে কেন্দ্র করে একজন চল্লিশার্ধ পুরুষের জীবনে মানসিক জটিলতা তৈরি হয়। সুফলের পরিবার বলতে তার স্ত্রী, মা, সুফলের ঠাকুরদা। সুফলের স্ত্রী লক্ষ্মী দেখতে কালো। তার মা ইচ্ছে ছিল গঙ্গা স্নান করবে, কলকাতা দেখবে। তার মায়ের প্রস্তাবে লক্ষ্মীও বলে যে সেও কলকাতা যাবে। তাই সুফল ঠিক করে যে তাদেরকে এক ময়দানের মিটিনের সময় কলকাতা নিয়ে যাবে। এই সময় গেলে তারা নিখরচায় যেতে পারবে, সেখানে তাদের খাওয়ার অভাব হবে না অথচ তাদের কলকাতা দেখার আশাটাও পূর্ণ হবে। লেখক এখানে সাধারণ মানুষের মনের কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। তা সুফলের একটা কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

" মিটিন আছেক। কইলকাথার ময়দানকে বঢ়িয়া মিটিন্। পার্টি দাদাবাবুরা গাড়িভাড়া দিয়্যেঁ লিয়ে যাবেক, ভাত, দিবেক, লিখরচায় কইলকাথা দেইখ্যেঁ আসবি সব্বাই-গঙ্গাচ্ছান কইর‍্যেঁ আসবি সব্বাই।"[১১]

কলকাতা যাওয়া বা দেখার দাবি মূলত উঠে এসেছিল সুফলের মায়ের কাছ থেকে। সুফলের মা গঙ্গা স্নান করে পূজো দিতে চেয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মীও তার স্বামী সুফলের কাছে বায়না করছে সেও কলকাতা ঘুরতে যাবে, কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া ও চিড়িয়াখানা দেখবে। লক্ষ্মী ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত মেয়ে। তার স্বামী, পরিবার ও সংসারকে ঘিরে লক্ষ্মীর যেন প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সংসারের সমস্ত দায়বদ্ধতা লক্ষ্মীর মতো মানুষেরা জানে। সুফলের বাড়ীতে লক্ষ্মী আসার পর সংসার যেন অন্য রূপ নিয়েছে। সংসারের নানান অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মী তার প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস, আচরণ ও ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে, সংসারের সমস্ত অভাব

অনটনকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে তারা এমনসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে সুখী হয় যা অন্য মানুষদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছকর ঘটনা। কিন্তু যখন ভাগ্যের পরিহাসে তারা খুসির আলো দেখে তখন যেন মনে হয় বিধাতাও তাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুফল ও লক্ষ্মীর সংসারেও যেন তাই নেমে এসেছে। তারা গঙ্গা স্নান করে পূজো দেওয়ার জন্য কালীঘাটে যাবে তখনেই তাদের জীবনে এক ঘোর অন্ধকার নেমে এল। আসল দোষ কি তাদের ভাগ্যের নাকি তাদের এই খামখেয়ালি পনার। যার ফলে সুফলের মা, বড় ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী লক্ষ্মী তো মরলই তারদের সাথে লক্ষ্মীর গর্ভে থাকা সন্তানও মারা গেল, যার ফলে লক্ষ্মী এই ভব সংসারে তার সন্তানকেই দেখে যেতে পারল না।

'জীবে দয়া' গল্পটি নবনীতা দেবসেনের 'গল্পগুজব' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পের কেন্দ্রীর চরিত্র গল্পকথিকা খুখু, তার দুই মেয়ে ও তার মা। গল্পটিতে দেখা যায় 'জীবে দয়া' বিষয়টি পশুপাখিকে কেন্দ্র করেই হোক বা মানুষকে কেন্দ্র করেই হোক এটি একটি দয়ারেই প্রতিরূপ। গল্প কথিকা তার মায়ের বাড়িতে থাকে। তিনি বলেছেন তার পিতা বট বৃক্ষের মতো ছিলেন, এখন তার পিতা নেই। গল্প কথিকার দুই মেয়ে পশু-পাখিদের পোষে এবং অসুস্থ পশু-পাখিদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসে সেবাযত্ন ও চিকিৎসা করে থাকে, আর এতেই তারা আত্মতৃপ্তি বোধ করে। গল্পকথিকাও তাদের দুই মেয়ের এই কাজে অনেকটা সাহায্যো করে থাকে। এটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তার এই উক্তিতে-

> "এ-বাড়িতে প্রচন্ডরকম জীবে দয়ার ট্রাডিশন- আমার মেয়েরা অষ্টাবক্র মুনির মতো জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ট হয়েছে।"[১২]

কিন্তু গল্প কথিকার মা তাদের এই জীবে দয়া কাজে অনেকটা বিরোধিতা করতেন। তা গল্প কথিকার মায়ের একটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "বোঝো এখন আমার কষ্টটা! মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে।"[১৩]

গল্প কথিকা যদিও তাদের দুই মেয়ের সহমত ছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে আক্ষেপ প্রকাশ করতেন। তিনি বলেন-

> "ওদের বুকে জীবে দয়া যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাচ্ছে।-অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খুব সীরিয়াস বলে মনে হয় না।"[১৪]

গল্প কথিকা তার মার সংসারকে বলেছেন 'আসল সংসার' আর তার নিজের সংসারকে বলেছেন 'খেলাঘর'। তার মায়ের সংসারকে আসল সংসার বলার কারণ হল, তার মায়ের সংসারের মাথা ছিলেন তাঁর বাবা, এখন তার বাবা নেই। তার বাবা থাকার সময় সেও অনেক পশুপাখি পোষ মানাত, যেমনটা তার মেয়েরা করে থাকে। তার খেলার সংসারে তার মাথা নেই বলতে তার মেয়েদের বাবা নেই। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন-

> "যেন রান্নাবাড়ি খেলছি – ঘরকন্নাটাকে কিছুতেই আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ সংসার যেন ভবসংসার-এর কান্ডারী সত্যি করে তিনিই, যিনি এই অখন্ড মণ্ডলাকার ব্রক্ষান্ডটিকে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।"[১৫]

গল্পকথিকা মাঝে মধ্যে সংশয় অনুভব করেন যে তার দুই মেয়ে পশুপাখিদের যেমন সেবা যত্ন করে তেমন ভাবে যদি তার মায়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ না দেয় তা নিয়ে তার সংশয় হতো। তার এই সংশয় অনেকটা মনোগত। তার এই সংশয় উদয় হয় যখন তার দুই মেয়ে যখন বড় হবে তখন তাদের মধ্যে এই একই মমত্ববোধ থাকবে? তারা কি তাদের মা কে দেখবে? তার এই দুশ্চিন্তা আসলে তার চারপাশের পরিবেশ মানুষকে দুশ্চিন্তার সম্মুখীন করতে বাধ্য করায়। তার এই সংশয়ের কথা তার উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে-

> "আমি যখন বুড়ো হবো, তোমাদের এই মনগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে।"[১৬]

তখন গল্পকথিকার মেয়ে সারল্যের সাথেই বলেছেন-

> "দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? "[১৭]

গল্পকথিকা তার মাকে যত্ন করেই রেখেছেন। সর্বোপরি বলা যায় মানুষেই পারে শিক্ষাদান করতে, তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে। অবশ্য আমরা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এর ব্যতিক্রমও দেখে থাকি।

'পরীক্ষা' গল্পটি নবনীতা দেবসেন আর একটি অন্যতম গল্প। এই গল্পটিতে লেখিকা দেখিয়েছেন মা ও মেয়ের অভূত পুর্ব বন্ধন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মা মেয়ে। মেয়েটি দশম শ্রেণীতে পড়ে, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এবিষয়ে তার মা অত্যন্ত উদবিগ্ন কিন্তু মেয়েটির পড়াশুনার মনোযোগ তেমন একটা নেই। মেয়েটি সবসময় কুকুর, বিড়াল নিয়েই সবসময় ব্যস্ত থাকে। কেবল পড়াশুনা নিয়ে সে উদবিগ্ন থাকে। তার এই উদবিগ্নতা একটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ইতিহাসের শিক্ষক তাকে বলছে সিলেবাসটা দেখার জন্য তখন মেয়েটি বলে-

> "দাঁড়ান ফোন করে জেনে নিচ্ছি! আমার বন্ধুরা জানে।"[১৮]

আর একটি বাক্যের মধ্যে তার উদাসীনতা ধরা পড়েছে যখন টিউশনের শিক্ষক খাতা ও কলম দিতে বলছে, তখন মেয়েটি বলছে-

> "বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলম। এই যে খাতা।"[১৯]

তার পড়ার যে একটুও ইচ্ছে নেই তার এই কথাগুলোর মধ্যে ধরা পড়ে। মেয়ের এই উদাসীনতা মায়ের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বৃদ্ধি করে। মাধ্যমিক পরীক্ষা যেন মেয়ের নয়, তার মায়ের। প্রত্যেক বাবা-মা'র মধ্যেই সন্তানের সাফল্যেই আলোড়িত হয়ে ওঠে পিতামাতার সাফল্য। পরীক্ষা গল্পেও আমরা তাই লক্ষ্য করে থাকি, মা তার মেয়ের পরীক্ষার ফল যাতে ভালো হয় তার চেষ্টায় করে গেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক রেখেছেন তার মা। কিন্তু মেয়ের এই উদাসীনতা দেখে অনেকেই পড়াতে চায় না। তা সত্ত্বেও মেয়ের মা টিউটর জোগাড় করেছেন। তার এক বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারি মাসে। ফিজিক্স-কেমেস্ট্রি পড়িয়ে দিতে।একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে।"[২০]

তার মা নানাভাবে চেষ্টা করে গেছে মেয়ে যাতে পরীক্ষায় ভালোভাবে উর্ত্তীণ হতে পারে।

মা তার নিজের পড়াশুনার কথা স্মৃতিচারণ করলেন। এখন সে মেয়ের সাথে যেভাবে জড়িয়ে আছে সে(মা) যখন পড়াশুনা করেছে তখন এটা ছিল না। তখন নিজের নিজের মধ্যে পড়ার দ্বায়িত্ববোধ জন্মাতো। মেয়ের পড়াশুনা বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ দেখা যায়। তা তার মায়ের একটি কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "মেয়ে খউব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দ্রিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী।"[২১]

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় পড়া বাদ দিয়ে নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠা। যেটা আমরা দেখে থাকি 'পরীক্ষা' গল্পের মেয়েটির মধ্যে। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে আগে প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল এখনকার থেকে। এখন প্রত্যেক মা-বাবাই তাদের সন্তানদের শ্রেষ্টরুপ প্রতিপন্ন করতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। এই গল্পের মা'ও এর ব্যতিক্রমী নয়। পরীক্ষা গল্পে মা ও মেয়ে আজীবন রূপ পরীক্ষা সমবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের সমাজে পরীক্ষা কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের সম্পর্ক ও জীবনের নানা দিক এখানে পরীক্ষার সম্মুখীন করে। প্রকৃত শিক্ষা বা জীবনের আসল অর্থ শুধু পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হওয়া নয়, বরং মানবিকতা স্বাধীন চিন্তা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিকাশ।

'চোর ধরা' গল্পটি নবনীতা দেবসেনের 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পগ্রন্থথেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইতু। ইতু হচ্ছে গল্পকথিকার বোন। 'চোর ধরা' গল্পটি শুরু হয়েছে ইতুর পরিচয় দিয়ে। সে খুব সুন্দর রেডিওতে গান করতে পারে। তাই গল্প কথিকা বলেছেন-

> "রেডিওতে তার গলা শুনতে পেলেই আপনার হাতের গ্রাস হাতেই থেকে যায়, একপায়ে জুতো পরে আপনি ভুলে অন্য পায়ে চটি গলিয়ে ফ্যালেন। আমার বোন ইতু এমনই গুনের মেয়ে।"[২২]

গল্পকথিকা বলেছেন যে আমার বোনাই অর্থাৎ ইতুর স্বামীও ওনেক গুনের আধার। ইতুর স্বামীর নিজের একটা আইন কোম্পানী আছে সেটাতে সে ডিরেক্টর, সে অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। ইতুর স্বামীর মনটা উদার, বেশ দিলখোলা দরাজহস্ত মানুষ। ইতু তার স্বামীকে খুব ভালোবাসে, তা গল্পকথিকার বক্তব্যতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "ইতুই তাঁর জীবন সর্বস্ব, নয়নমণি। উঠতে ইতু, বসতে ইতু, খেতে ইতু, শুতে ইতু। মানুটিই ইতুসর্বস্ব।"[২৩]

গল্পকথিকা তার বোনের সংসার চালানোর কাজ দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান। তাই তিনি বলেছেন-

> "এই জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে কোমরে গুঁজে রেখে ইতু অনায়াসে সংসার করে, ছেলেপুলে সামলায়, ছাত্রছাত্রী সামলায় এবং নিজের গানকে দিনকে দিন উন্নত করে। কিন্তু একা স্বামীটিকে নিয়ে তার যত জামেলা; পনেরোজন বেসুরো ছাত্র, তিনজন অবাধ কাজের লোক কোয়াটার ডজন অপোগণ্ড সন্তান নিয়েও তার আর্ধেক গোলমাল নেই। ইতু দশভুজার মতো ছুটে ছুটে সবদিকে সামলায়।"[২৪]

ইতুর স্বামীকে দেখে সবাই ভয় করে। ইতুর স্বামীও ইতুর জয়গান করে থাকে। সে(ইতু) তার দুহাত দিয়েই দশভুজার মতো নিজের ছেলেমেয়েকে, স্বামীকে, চাকবাকরকে নিয়ে সংসার সামলায়। আর একইভাবে দেখা যায় তার গানের ক্লাসটিও সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় মূলত ইচ্ছাশক্তি থাকলেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, নানা প্রতিকুলতাকে জয় করে সংসারটিকে সুন্দর পরিবেশে তৈরী করা যায় তারই প্রতিরূপ হল ইতু।

তেমনেই নবনীতা দেবসেনের আর এক অন্যতম গল্প হল 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন'। গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই দুজন ভারতীয় নাগরিক নারীর অসম্ভব দুঃসাহসিকতার কথা। তাদের মধ্যে একজনের নাম রেনুকা, সে তামিলনাড়ুর মেয়ে, অন্যজন বাঙালি নবনীতা। তারা দুজনেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসাথে পড়াশুনা করত, সেখান থেকেই তাদের দুজনের বন্ধুত্ব। তাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গ জয় করার, তাই তারা ইস্টার ছুটিতে তাদের এই বাসনাকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। যেসময় তারা পাড়ি দিয়েছিল তখন ভারতবর্ষের কোন নারী পর্বত শৃঙ্গ জয় করতে পারেনি। ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গটি যেমন উঁচু তেমনেই খাড়া। আল্পসের এই দুর্গমগিরি জয়ের জন্য তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, তাদের না ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য না ছিল পর্যাপ্ত অর্থ ও অন্য ব্যক্তিদের থেকে সুপরামর্শ নেওয়া। এই বরফযুক্ত ম্যাটারহর্ন পর্বতে উঠতে যে তাদের কাঁটাযুক্ত জুতোর দরকার সেই জুতোই তাদের ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল অসীম সাহসিকতা ও অফুরন্ত আশা যা তারা ম্যাটারহর্ন পর্বত জয় করবে। যদিও শেষপর্যন্ত তারা ম্যাটারহর্ন পর্বত জয় করতে পারেনি ঠিকেই কিন্তু তাদের মনে যে অসীম সাহসিকতা ছিল তা সাধুবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না।

'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত এক অন্যতম গল্প হল 'সেদিন দুজনে'। গল্পটিতে আলোচিত হয়েছে মার্কিনমূলকে অবস্থিত এক ভারতীয় দম্পত্তির জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে। গল্পকথিকা বলেন কর্ত্তা দেখতে ছিল সাদা ধবধবে, লম্বাচওড়া আর গিন্নি ছিল তার উল্টো, তার কর্তার তুলনায় ছোটখাটো কালো বর্নের। কর্ত্তা ছিল অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক আর গিন্নি তেমনেই ছটফটে দুরন্ত। লেখিকার ভাষায় 'সভ্যতাবিবর্জিত বন্যপ্রাণী'। কিন্তু চেষ্টা করে যেত সংসারটিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে, কিন্তু তার কোন বাস্তব বুদ্ধি নেই। কোন কথাটি কার সামনে কখন বলতে হবে, আর কোথায় বলা যাবে না তার স্বামী ইশারা সত্ত্বেও বলে ফেলেন। কর্ত্তা মাঝেমধ্যে বিরক্তবোধ করে তার গিন্নির প্রতি। কিন্তু তার এই সরলতাই তাঁর মধ্যে নিজস্বরুপ সত্তা সৃষ্টি করে, যার ফলে কর্ত্তার সত্তাকে আলোকিত করে তোলে।

লেখিকা 'সেদিন দুজনে' বোঝাতে চেয়েছেন ভালোবাসা মানে শুধু একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরের মনের গভীরে বহন করা। মানুষের ভালোবাসা চিরজীবি – যদিও জীবন যাপন সামাজিক নিয়ম বা পরিস্থিতিতে মানুষকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। সম্পর্কের মধ্যে যে নীরবতা বা অমীমাংসিত প্রশ্ন থাকে তা না বলা কথা গুলোই ভালোবাসাকে আরও বাস্তব ও বেদনাময় করে তোলে। এখানে লেখিকা ভালোবাসার নীরব, বেদনাময় ও অথচ চিরন্তন রুপকে তুলে ধরেছেন- যেখানে বিচ্ছেদও একধরনের মিলন, আর অপুর্ণতাও ভালোবাসার আরেক রূপ।

কথাসাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন বাংলা ছোটগলের এমন এক লেখক, তিমি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সাহিত্য সৃষ্টির আসল উপাদান লুকিয়ে আছে আমাদের চারপাশের নিত্যদিনের সাধারণ জীবনযাপনে। তাঁর গল্পে

কোন জটিল বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত নয়, বরং তিনি তাঁর ছোটগল্প গুলোতে সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই তার গল্পের জন্ম। ফলে তার গল্পে জীবন যেমন আছে তেমনেই তাঁর গল্পে জীবনের শিল্পরূপও আছে। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে নিত্যদিনের নানা উপাদান যেমন- বাজার, অফিস, সংসার, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক আচার বারবার উঠে এসেছে এবং নারী অভিজ্ঞতার বিশেষমাত্রা তাঁর গল্পের এক অনন্য বৈশিষ্ট ও নারীর টানাপোড়েন, সামাজিক বাধা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা ইত্যাদি তিনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পের মূল উপকরণ হিসেবে। এই সাধারণ জীবনের বাস্তবতাকে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক অথচ সঙ্গবেদনশীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। বাস্তবতা থেকে শিল্প উত্তরণের দিকটিই তাঁর সৃষ্টির আসল শক্তি। তিনি সরাসরি জীবনকে অনুলিপি করেননি বরং তাকে রূপ দিয়েছেন নানা শিল্পসুষমায়। যেমন তিনি 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ' গল্পে গ্রামীণ পশ্চাদপদ, রাজনীতি এবং নারীশিক্ষার চিত্রকে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। গল্পে মধ্যবিত্ত সংসারের টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের হিসেব নিকেশ সাহিত্যে রুপ পেয়েছে। ভালোবাসা কারে কয় গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পে তিনি প্রেম ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। এটি মূলত নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা হলেও লেখিকার সৃজনশীল রুপায়নে হয়ে উঠেছে শিল্পসমৃদ্ধ। লেখিকা নবনীতা দেবসেন সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেবল নথিবদ্ধ করেননি, বরং সেগুলোকে শিল্পরুপে রুপান্তর করেছেন। তাঁর ছোটগল্প প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের জীবনেই সাহিত্যের প্রধান উৎস, আর লেখকের সংবেদনশীল সৃষ্টি সেই জীবনকেই চিরস্থায়ী শিল্পে পরিণত করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র:

১. দেবসেন, নবনীতা। *গল্পসমগ্র* - ১। নিবেদন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১।
২. তদেব, পৃ. ১।
৩. দেবসেন, *নবনীতা, গল্পসমগ্র* - ১। নিবেদন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০২৩, পৃ. ৮৭।
৪. তদেব, পৃ. ৮৭।
৫. তদেব, পৃ. ৮৭।
৬. তদেব, পৃ. ৮৮।
৭. তদেব, পৃ. ৮৮।
৮. তদেব, পৃ. ৮৮।
৯. তদেব, পৃ. ৯১।
১০. তদেব, পৃ. ১২৮।
১১. তদেব, পৃ. ১৩০।
১২. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১৭০।
১৫. তদেব, পৃ. ১৭২।
১৬. তদেব, পৃ. ১৭৬।
১৭. তদেব, পৃ. ১৭৬।
১৮. তদেব, পৃ. ১৫৭।
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৭।
২০. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২১. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২২. তদেব, পৃ. ২৭৫।
২৩. তদেব, পৃ. ২৭৫।
২৪. তদেব, পৃ. ২৭৫।